KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

নারীমুক্তি এবং সামাজিক-ন্যায় আন্দোলনের অগ্রদূত পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর

সংক্ষিপ্তসার:

১৯২২ সালের ৫ এপ্রিল এক মহান মহীয়সী ভারতীয় নারী ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছিলেন। ২০২২ সাল ছিল তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকী বর্ষ। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন ভারতবর্ষের সেই মহান মহীয়সী নারী, যিনি নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, স্ত্রীজাতির বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন -তিনি হলেন পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় নারী শিক্ষার বিষয়টি ছিল একেবারে নড়বড়ে, সুসংগঠিত কোনো পরিকাঠামো ছিল না। রাষ্ট্রবাদী সমাজ কর্তৃক নারীসত্ত্বার কোনো স্বীকৃতিও ছিলনা, নারীর অধিকার যে পুরুষের সমান, সেটাও সমাজ ভাবত না। যদিও রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই, তবুও এই সমাজে নারীর অবস্থান একেবারে শোচনীয় ছিল। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, জাত ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, উচ্চশ্রেণির বিধবা মহিলার নিয়মের বেড়াজাল, প্রভৃতি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সমাজের প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই রকম পরিস্থিতিতে হিন্দু নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য নারীদের শিক্ষিত করতে এবং হিন্দুদের গোঁড়ামি ও পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে নারীদের মুক্তির পথ দেখান রমাবাঈ। এরই প্রেক্ষিতে রমাবাঈয়ের কর্মপ্রচেষ্টা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের জন্য তাঁর কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য পর্ব হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসে স্থান দখল করেছে। সাম্প্রতিককালে নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ-সাম্য ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবিতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন রমাবাঈয়ের লেখা ও তাঁর কাজের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে। তিনি নারী শিক্ষা, নারীমুক্তি, শ্রমিক নিপীড়নের বিরুদ্ধেও নিরলস আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। সামাজিক ন্যায় ও অসম শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল শক্তিশালী। তাই এক অসাধারণ নারী পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর অসামান্যা হয়ে ওঠার কাহিনী আমি, আমার এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সূচকশব্দ: পন্ডিতা, সরস্বতী, স্ত্রী ধর্ম নীতি, আর্য মহিলা সমাজ, মুক্তি মিশন, সারদা সদন, সেবা সদন, মুক্তি সদন, লেডি ডাফরিন, কাইজার-ই-হিন্দ।

এক

বিখ্যাত ভারতীয় মহিলা সমাজ সংস্কারক পন্ডিতা রামাবাঈ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কর্ণাটক রাজ্যের কাছে গঙ্গামূলের জঙ্গলাকীর্ণ কার্কেলে অঞ্চলে অনন্ত শাস্ত্রী ডোংগ্রের কনিষ্ঠা কন্যা রূপে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সালে এক উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারক, জ্ঞানী পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন

অনন্ত শাস্ত্রীর কন্যা রমাবাঈ। তবে তাঁর জীবনে চলার পথ সহজ ছিল না। অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারাতে হয়েছিল তাঁকে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিজের জন্য এবং স্ত্রীজাতির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। পন্ডিতা রমাবাঈ এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্য ও হিন্দু সমাজের সংস্কার ভারতীয় সমাজকে পিতৃতান্ত্রিকতার মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদের চারণক্ষেত্রে পরিণত করে তুলেছিল। তার বিরুদ্ধে তিনি পিতার পথ অনুসরণ করে স্ত্রীজাতিকে মানব মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। রমাবাঈয়ের পিতা অনন্ত শাস্ত্রী একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন একজন সমাজ সংস্কারক। তখন নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। রমাবাঈয়ের পিতা অনন্ত শাস্ত্রী তাঁর বালিকা বধূকে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেওয়ায় তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের রোষানলে পড়ে ছিলেন। এইসময় অনন্ত শাস্ত্রী গ্রাম ছেড়ে বনাঞ্চলে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্র অঞ্চলের গুনমল অরণ্য অঞ্চলে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে থাকেন। সেখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন রমাবাঈ।[১]

অতঃপর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রামাবাঈয়ের আঠারো বছর বয়সে পিতা অনন্ত শাস্ত্রী এবং মাতা লক্ষ্মীবাঈ উভয়ই এবং দিদি প্রায় একই সঙ্গে মারা গেলে রমাবাঈ ও তাঁর ভাই শ্রীনিবাস অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন থেকে নিজেদের বিরত রাখেন নি। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর রমাবাঈ তাঁর ভাইকে নিয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নারী শিক্ষার প্রসারের কাজে অগ্রসর হন। রমাবাঈ ছিলেন একজন সুবক্তা। ১৮৭৮ সালে রমাবাঈ কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। এরপর রমাবাঈয়ের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বেদ, পুরাণ ও সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি 'পন্ডিত' ও 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতায় এসে তিনি পন্ডিতমহল ও ব্রাহ্মণ সমাজের নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন এবং বিভিন্ন সভায় সংস্কৃত গ্রন্থকে উদ্ধৃত করে নারী মুক্তি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু এর অল্প সময়ের মধ্যেই ১৮৮০ সালে তাঁর যখন বাইশ বছর বয়স তখন কলেরা রোগে তাঁর একমাত্র ভাইও মারা যান। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু স্থানীয় আইনজীবী বিপিনবিহারী দাস মেধাবীকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যান এবং সঙ্গে তখন তাঁর ছিল একমাত্র শিশুকন্যা মনোরোমা। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ। শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় এবং পরামর্শে এরপরে রমাবাঈ পুণা রওনা হন। সেখানে বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। রমাবাঈ সেখানে ১৮৮২ সালে "আর্য মহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহিলাদের উন্নতি ও কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পুণা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে "আর্য মহিলা সমাজে"র শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং "প্রার্থনা সমাজে"র সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখেন পন্ডিতা রমাবাঈ। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণ হয়ে নিচু জাতের লোককে বিয়ে করে ছিলেন রমাবাঈ। যেটা ছিল তৎকালীন সমাজে রীতিবিরুদ্ধ কাজ। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে বিবাহ করে তিনি তাঁর কুসংস্কার মুক্ত মানসিকতার এবং অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিবাহের পর পুন:রায় তিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে নারী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি ও তাঁর স্বামী বিপিনবিহারী বিধবাদের জন্য স্কুল চালু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে যায়, স্বামী মারা গেলে সে কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও তৎকালীন সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ধর্মবিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হতো। তার পাশাপাশি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বৈধব্য প্রাপ্ত জীবন তাঁর সামাজিক কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি সে

বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। নিজেকে প্রচলিত বৈধব্য জীবনের কাছে সমর্পণ করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লক্ষ্য স্থির থাকেন এবং ভারতীয় সমাজে বিশেষত্ব মহিলাদের বৈধব্য যুবতী জীবনকে সমাজে ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন।[২] রমাবাঈয়ের জীবন ও জীবনযুদ্ধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্র বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় 'পিতার শাসন'। অর্থাৎ বাল্যকালে পিতার অধীনে কন্যাকে বড় হতে হয় এবং পিতার নিয়ন্ত্রণে থেকে পতি নির্বাচন করে স্বামীগৃহে পদার্পণ করতে হয়। আসলে পিতৃতন্ত্র বলতে প্রাচীন সমাজে পরিবারের বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিকে, যিনি পরিবারের সার্বিক নিয়ন্ত্রক তাঁকেই বোঝায়। আধুনিক সমাজ ও প্রাচীন এই প্রথাকে বয়ে নিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সাধারণভাবে 'তন্ত্র' কথাটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘ প্রবাহমান কাল ধরে। রমাবাঈয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও দেখা যায় একই প্রবণতা। কিন্তু তিনি সেই প্রবণতা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আধুনিকতার শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে নিজেকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। এবং নিজ উদ্যমে ও উৎসাহে তিনি পারিবারিক গন্ডি অতিক্রম করে সরকারি বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা ছেড়ে ইংল্যান্ডের চলে যান। এরপর সেখানে গিয়ে তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সংস্পর্শে আসেন এবং মিশনারিদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হন। ফিরে আসার পূর্বে তিনি অল্প বয়সী কন্যাদের নিয়ে খ্রিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবর্ণের বৈধব্য প্রাপ্ত মহিলাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তবুও তিনি দ্বিতীয়বার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমবার তিনি নিম্নবর্ণের বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেছিলেন, আর দ্বিতীয় বার তিনি নিজের সিদ্ধান্তে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এটা ভারতীয় হিন্দু সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি উচ্চমার্গীয় চিন্তা ভাবনার ফসল। তৎকালীন বর্ণ শাসিত সমাজে ৯ বছরের বালিকা কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। এই বিবাহ দেওয়ার সম্পূর্ণ হলে পিতার অশেষ কোনো লাভ হয় বলে সমাজ মনে করত। বাংলায় এই প্রথাকে বলা হতো 'গৌরিদান'। গৌরিদানে পিতা অপরাগ হলে হাতেনাতে ফল প্রাপ্তি; তা হল -সমাজচ্যুতকরণ। বালিকাদের সম্মতি-অসম্মতির উপর কোনো গুরুত্ব তো ছিলই না বরং অবধারিতভাবে সৃষ্টি হতো বাল্যবিবাহের আরেকটি শ্রেণি। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিভূ লর্ড ডালহৌসির চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবাদের পুন:রায় বিবাহ করার অধিকার চালু করা হয়েছিল।

দুই

স্বামীর মৃত্যুর পর রমাবাঈ কলকাতা ছেড়ে পুণায় চলে যান বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড করবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্ন নিয়ে। পুণাতে গিয়ে রমাবাঈ প্রথম বছরেই তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেন। প্রথমত: উচ্চবর্ণের প্রগতি মনস্ক যেসব মহিলা বালিকাদের শিক্ষা দেন এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন, তাঁদের নিয়ে সেখানে তিনি "আর্য মহিলা সমাজ" নামে একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সমাজে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অতীতের আর্য বৈদিক সমাজের পুনর্নির্মাণের ধারণা নিয়ে এই সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মহিলাদের মুক্তির জন্য পন্ডিতা রমাবাঈ আর্য মহিলা সমাজের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর্য মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দূরীভূত করার একটি সংস্থা হিসেবে। তিনিও এই অভিমত পোষণ করেন যে পন্ডিতা রমাবাই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মহিলাদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই সময়কালে সমাজে গোঁড়া

হিন্দুদের দাসত্ব, অল্প বয়সে বিধবা হওয়া, বহুবিবাহ ও বৃদ্ধদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি সামাজিক অন্যায়ের ফলে মহিলাদের সমস্যা ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এইসব সমস্যা থেকে রমাবাঈ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি, গভীরভাবে এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ রমাবাঈয়ের লিখিত প্রথম বই "স্ত্রী ধর্মনীতি" মারাঠি ভাষায় ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার ইংরেজি অনুবাদ "Morals for women" প্রকাশিত হয়েছিল ঐ বছরেই। এই কাজটি ছিল তাঁর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তৃতীয়তঃ ব্রিটিশ ভারতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপন কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য শিক্ষা বিষয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়; যা "হান্টার কমিশন" নামে পরিচিত।[৩] এই শিক্ষা কমিশনের সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণে বলেন যে, দেশের শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। রমাবাঈ এই কমিশনের কাছে কতকগুলি সুপারিশ পেশ করেন। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল -শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মহিলা স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা এবং নারীদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন, তাই মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তি করার সুযোগ দেওয়ার সুপারিশ পেশ করেন পন্ডিতা রমাবাঈ। রমাবাঈ কোনো পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এই প্রস্তাব দেননি; তাঁর এই প্রস্তাবের পেছনে মূল কারণ ছিল ভারতীয় সমাজে মহিলাদের রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে তাঁদের প্রয়োজন বা চাহিদা ব্যক্ত করার জড়তা বা ভীতিই ছিল প্রধান কারণ। তাঁর এই প্রস্তাব ব্রিটেনের রানিকেও মুগ্ধ করেছিল এবং ভারতীয় মহিলাদের জন্য তাঁর উদ্যোগে মহিলা চিকিৎসক পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই সুপারিশ তৎকালীন সময়ে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে লেডি ডাফরিন মেয়েদের মেডিক্যাল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার আন্দোলন করেছিলেন।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রমাবাঈ শিক্ষক হিসাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য "ইপিসকোপালিয়ান চার্চে" যোগদান করেন। এই চার্চের আমন্ত্রণে রমাবাঈ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা লাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বোম্বেতে তিনি মহারাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম কিশোরী বিধবাদের জন্য স্কুল ও হোস্টেল 'সারদা সদন' চালু করেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে তিনি এই সদন বোম্বে থেকে পুনেতে স্থানান্তরিত করেন এবং সদনের নামে একটি ট্রাস্টও গঠন করেন। এই সময় তিনি আশ্রিতাদের অর্থকরী জীবিকার জন্য জমি ক্রয় করে 'মুক্তি সদন ফার্ম' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এটি "মুক্তি মিশন" নামেও পরিচিত। এটি পুণা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে কেদগাঁও এ স্থাপিত হয়েছিল। সাধারণতঃ পরিবার থেকে প্রত্যাক্ষিত দুস্থ পরিবারের মহিলাদের জন্য এই মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুক্তি মিশন সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই মিশনে বিধবা মহিলাদের আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া হতো এবং দরিদ্র অসহায় এবং অন্ধ মহিলাদের পরিষেবা দেওয়া হতো। এখানে একটি স্কুলে একত্রে ৪০০ ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রমাবাঈয়ের নেতৃত্বে কয়েক শত দুর্ভিক্ষ পীড়িত নারী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর নির্মিত আশ্রয় শিবিরে। যেহেতু, রমাবাঈ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন সেহেতু ভারতীয় খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানে বিরোধিতা করে। সারদার সদনের প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান মিশনারির অর্থানুকূল্য থাকার ফলে সারদার সদনে বাইবেল পাঠ ও ধর্মান্তরিতকরণ শুরু হলো।[৪] এর ফলে অনেকে সারদা সদন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সারদা সদনকে "Widows Mission House" বলে অভিহিত করে। এই ঘটনা প্রবাহে এবং ১৮৯০ সালে পশ্চিম ভারতে প্লেগ -এর প্রাদুর্ভাবের ফলে রমাবাঈ সারদা সদনকে কেদগাঁওয়ে সরিয়ে নতুন নামকরণ করেন "মুক্তি মিশন"। এখানে প্রায় দু'ই হাজারের বেশি মহিলা আশ্রয় পায় এবং তাঁদের মধ্যে হিন্দু

বিধবা মহিলা ছাড়াও দুর্ভিক্ষ পীড়িত, স্বামী পরিত্যক্তা, অন্ধ এবং বৃদ্ধা মহিলারাও ছিলেন। এখানে মহিলারা বয়নশিল্প, উদ্যানচর্চা, কৃষিকাজ, পশুপালন ও রান্নার কাজ ছাড়াও একটি মুদ্রণ কারখানা চালাতেন। সারদা সদনের মত এখানেও রমাবাঈয়ের লক্ষ্য ছিল মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা এবং তাঁদের বঞ্চনা ও শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়া।

তিন

পন্ডিতা রমাবাঈয়ের সংগ্রাম শুধুমাত্র নারী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর দৃঢ় পদচারণা। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে দশ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে তিনি অন্যতম একজন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। বোম্বাইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য রমাবাঈকে অনুরোধ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে পার্লামেন্টে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে এবং অন্যান্যরা মহিলাদের অংশগ্রহণের পক্ষে মত পোষণ করেননি। পন্ডিতা রামাবাঈ তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত অধিবেশনে সাত-আটজন প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি মহিলাদের পাদপ্রদীপে আনার নিরলস প্রচেষ্টা করে যেতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "সারদা সদন"-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কাশীবাঈ কানিৎকারকে পৌরোহিত্য করতে আহবান জানান এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানের রমাবাঈ রানাডেকে অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থাপিত করেন। তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্দশার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন জনসভায় সমবেত হয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এমনকি ভাইসরয় ও তাঁর পত্নীকে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে লিখিত প্রস্তাবও তিনি পাঠান।[৫]

১৯০৪ সালের 'ভারত মহিলা পরিষদে'র প্রথম সভায় তিনি সভা নেতৃত্ব করেন। ১৯০৮ সালে সুরাটে, ১৯০১২ সালে বোম্বাইতে এবং ১৯২০ সালে সোলাপুরেও ভারত মহিলা পরিষদের অধিবেশনগুলোতেও সভাপতিত্ব করেন পন্ডিতা রমাবাঈ। ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের সাথে ও তিনি জড়িত ছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার পর ১৯২৩ সালে বোম্বাইতে নারীদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত রমাবাঈ বোম্বাই সেবা সদনের সভানেত্রী ছিলেন।

তাঁরই প্রচেষ্টায় সেবা সদনের আশ্রিতাদের চিকিৎসা বিষয়ে সেবাদানের সুবিধার জন্য ১৯১১ সালে 'ডেভিড সাসুন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং' -এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউসও চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে এই সেবার সদনে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ক্লাস, পাবলিক স্কুল, ডিপার্টমেন্ট অব মেডিক্যাল সার্ভিস এবং ইন্ডাস্ট্রি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, স্পোকেন ইংলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। রমাবাঈ ভারতে কিন্ডারগার্ডেন শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী পাঠক্রম হবে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাহিত্যে অনুকম্পা ও সংবেদনশীলতার পাশাপাশি নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন। শারীরবৃত্তীয় ও জীববিজ্ঞানের পাশাপাশি আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন পন্ডিতা রমাবাঈ। এছাড়াও তিনি বিশ্বের প্রথম মহিলা অনুবাদক, যিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেল গ্রন্থটি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি জীবনের শেষ ১২ বছর এই অনুবাদের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তিদানের পথিকৃৎ। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা, যাঁর নামের পূর্বে সংস্কৃত পন্ডিত হিসাবে 'পন্ডিতা' খেতাব যুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর নামের পর 'সরস্বতী' খেতাবও যুক্ত করা হয়েছিল।

চার

শ্রমিক নিপীড়নের বিরুদ্ধেও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল সোচ্চার। কলোনির শ্রমিকদের ওপর যখন শাসক শ্রেণি অত্যাচার করছিল, তখন তিনি তার প্রতিবাদে জনসমাবেশ করে সরকারকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণ যেমন সরকারের নিকট বাধ্য তেমনি, সরকারকেও জনগণের নিকট দায়িত্ব পালনে, তাদের অধিকার পূরণে বাধ্য থাকা উচিত। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের কার্যপ্রণালী গ্রহণ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকারকে দিয়ে বিভিন্ন সদর্থক কাজ করতে বাধ্য করাতেন। আর সরকারও অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষ এড়ানোর জন্য বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। এর পেছনে ভারতীয় যে মহিলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন পন্ডিতা রমাবাঈ।

পাঁচ

পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্য মহিলা সমাজ সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে "Nobel Women Society" স্থাপিত হয় নারী শিক্ষার বিস্তার লাভের এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। আর্য মহিলা সমাজের প্রভাব আহমেদনগর, থানে, বম্বে, সোলাপুর, গন্ধারপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করে। কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক রীতিনীতি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল। এইরকম সামাজিক অস্থিরতার পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে রমাবাঈয়ের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে।

লেখিকা হিসাবেও রমাবাঈ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রমাবাঈ কর্তৃক রচিত "Stri Dharma Niti" (Morals for women) (1882) এবং "The High Caste Hindu Women" (1887) বইগুলিতে তিনি হিন্দু বৈধব্য জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রমাবাঈ তাঁর "The High Caste Hindu Women" গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ মহিলা ডা. আনন্দিবাঈ যোশীকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে উৎসর্গ করে বলেছিলেন, "পুরুষতান্ত্রিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজে মেধা, মনন, পরিশ্রম ও সাহসিকতা দিয়ে যুগে যুগে যে সব নারীরা আজকের অবস্থান তৈরি করেন। সে সব নারীর কথা সমাজের অগ্রযাত্রাকে করেছে গতিশীল"। রমাবাঈ তাঁদের মধ্যে একজন, পন্ডিতা রমাবাঈয়ের সংগ্রামী ইতিহাস যুগে যুগে নারীর অগ্রযাত্রাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে। নারীর পদযাত্রাকে আরও দীর্ঘতর করবে। রমাবাঈয়ের বিভিন্ন লেখায় ও বক্তব্যে ভারতীয় হিন্দু দর্শনে মহিলাদের অবস্থান মর্যাদার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র নারী শিক্ষাই মহিলাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারে। ১৮৮৭ সালে লিখিত উপরিউক্ত গ্রন্থে তিনি সারা জীবন মহিলারা কি রকম অধঃস্তন মর্যাদার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। শৈশব অবস্থা থেকেই একজন মেয়ে তার ভাইয়ের থেকে নিজেকে কম গুণসম্পন্ন ভাবতে অভ্যস্ত হয় এবং উপেক্ষিত হয়ে থাকে। জগতের নিয়মে মেয়েদের জন্মানো প্রয়োজন বলেই তাদের জন্ম হয় এবং খেয়াল রাখা হতো যে কোনক্রমে মেয়েদের জন্মহার যেন ছেলেদের চাইতে বেশি না হয়। শৈশব অবস্থা থেকে উপেক্ষার ফলে বেশীরভাগ মেয়েই হয় রোগগ্রস্ত ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকারের হাতছানি। হিন্দু সমাজে মেয়েদের বাল্যবিবাহ তাদের শৈশবকে হত্যা করে দেয়। যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয় সেই বয়সে মেয়েরা বুঝতে পারে না যে, তাদের শিশুবেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করছে তারা। নব্য বিবাহিত বধু প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে কনিষ্ঠ

সদস্য হিসেবে এবং তাকে শ্বশুরালয়ে অত্যন্ত অনুগত একজন সদস্য হিসাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। শ্বশুরালয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কোনো পরিবেশও থাকেনা এবং পুরুষেরা মায়েদের প্ররোচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের স্ত্রীকে অবদমিত করে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। এসব সহ্য করেও মেয়েরা শ্বশুরালয়কে পুণ্যতীর্থ এবং স্বামীকে দেবতা মনে করে। শাশুড়ি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যেদের চাপে স্বামীর সঙ্গে সদ্যবিবাহিতা বধুর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।[৬]

রমাবাঈ নারীর দুর্দশার সঙ্গে জাতীয় সংকটের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। "The High Caste Hindu Women" গ্রন্থে রমাবাঈ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মহিলাদের পুরুষদের ওপর ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীলতা ও অজ্ঞতাই হলো হিন্দু জাতির সঙ্কটের মূল কারণ। মহিলাদের অজ্ঞতা, পরনির্ভরতা, বঞ্চনা এবং অপমান কালানুক্রমিকভাবে সদ্যোজাত শিশুদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি মনে করেন উচ্চবর্ণের নারীদের প্রথম প্রয়োজন হল আত্মনির্ভরতা, দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো শিক্ষা এবং তৃতীয় লক্ষ্য হলো দেশীয় মহিলা শিক্ষক। ১৯০৭ সালে রমাবাঈ তাঁর প্রকাশিত লেখা "A Testimony" গ্রন্থ তেও হিন্দু দর্শনে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং প্রাচীন গ্রন্থের বিশ্লেষকদের মত ব্যাখ্যা উল্লেখ করে দেখান যে তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের বিশ্লেষণে কিভাবে মেয়েদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে হিন্দু মেয়েরা নিকৃষ্ট, অপবিত্র এবং দৈত্যসমা হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে তাঁদের মুক্তির একমাত্র উপায় হল বহুযুগ ধরে স্বামীর একনিষ্ঠ সেবা। বহু জীবনব্যাপী স্বামীর পূজা এবং সেবার ফলেই কেবল তাদের এই দশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এভাবেই তিনি তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সময়কার নারীর অবস্থা তুলে ধরেছেন।[৭]

উনিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশক এবং বিংশ শতকের প্রথম দুটি দশক ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মকেন্দ্রীক আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ও নারী মুক্তি আন্দোলন। ব্যক্তিগত জীবনে নিদারুণ যন্ত্রণা ও মানসিক ক্লেশই রমাবাঈকে সুদৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন এবং লক্ষ্যে অবিচল এক বজ্রদৃঢ় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ভাষা ও বেদ পুরাণে পাণ্ডিত্যের সাথে ব্রিটেন ও আমেরিকায় তাঁর অধ্যয়ন ও বসবাস তাঁকে সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত অনুধাবনের সহায়তা করেছিল। সম্ভবত রমাবাঈই ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা যিনি দেশীয় মহিলাদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। উদারতাবাদের প্রতি প্রবল আসক্তি এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রমাবাঈকে যেমন ভারতবর্ষের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছিল; তেমনি বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ কট্টরপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিধবা ও অন্যান্য বঞ্চিত মহিলার মুক্তিকল্পে নিরলস প্রয়াস চালানোর প্রেরণা জুগিয়ে ছিলেন পন্ডিতা রামাবাঈ সরস্বতী। অনেকে রমাবাঈকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহনের জন্য তাঁর জাতীয়তাবাদী চরিত্র খর্ব করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগকে নস্যাৎ করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। রমাবাঈ মনে করতেন যে, মেয়েদের দুটি জীবন--একটি পারিবারিক এবং অন্যটি পরিবারের বাইরে সমাজের জন্য। দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য তাঁর বৃহত্তর ও সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। এ প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা মনোরমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রমাবাঈয়ের ধর্ম মাতা সিস্টার গেরেল্ডাইন এবং বিদেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা মনোরমাকে ইংল্যান্ডে রেখে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রমাবাঈকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে তিনি তীব্র আপত্তি জানান। মনোরমার জীবনে খ্রিস্টান দর্শনের

প্রভাব তিনি অনুমোদন করেন নি। রমাবাঈয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে, "মনোরমা দেশের মাটিতে থেকে দেশের মানুষকে ভালোবাসুক এবং একজন ভারতীয় মেয়ে হিসেবে সে গর্ববোধ করুক"। ১৯২১ সালে মনোরমার অকাল প্রয়াণের পরের বছরই রমাবাঈ মারা যান এবং নারী মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটে। যদিও ইতিপূর্বে ১৯২০ সাল থেকেই তাঁর শরীর একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছিল। এই সময় তিনি তাঁর সব কাজের দায়িত্ব কন্যা মনোরমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনজনদের মৃত্যুশোক তাঁর পিছু ছাড়েনি; তাঁর মেয়ের এই সময়ে অকাল মৃত্যু ঘটে। শোকে মুহ্যমান এই সমাজ সংস্কারক আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ৫ এপ্রিল ১৯২২ সালে। ৬৪ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পূর্বে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের মারাঠি ভাষার অনুবাদের খসড়াটি সুসম্পন্ন করেছিলেন। মারাঠি ভাষায় অনূদিত বাইবেল গ্রন্থটি প্রতিটি গির্জায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল পন্ডিতা রামাবাঈ সরস্বতীর সৌজন্যেই। রমাবাঈ জীবনের অধিকাংশ সময়ই নারী মুক্তি সংগ্রাম ও সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়েছিলেন। এই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার পন্ডিতা রমাবাঈকে "কাইজার-ই-হিন্দ" পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী লাভ করেছিলেন। মরনোত্তর স্বাধীনোত্তরকালে ১৯৮৯ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করে একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয়। একজন ভারতীয় লেখক এবং সামাজিক-ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম আলোকবর্তিকা ও নবশুকতারা মহীয়সী মহিলা ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা এবং অন্যতম সেরা ভারতীয় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২০২২ সাল ইতিহাসে স্মরণীয়। সেই মূর্তিমতী মহীয়সী নারী; নারীমুক্তির আলোকবর্তিকা এবং সামাজিক ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার নবশুকতারা পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর মৃত্য শতবার্ষিকী বর্ষ। আমরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহীয়সী নারীকে স্বশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

তথ্যপঞ্জি:

১. "Insight into Child Theology through the Life and Work of Pandita Ramabai." Oxford Centre for Mission Studies, 31 Oct. 2006. P- 71

২. Ramabai, Pandita. The High Caste Hindu Women. Maharashtra State Board of Literature and Culture, 1887. Reprinted 1981. P-95

৩. Chakravarti, Uma. Rewriting History: The Life and Time of Pandita Ramabai. Kali for Women, 1998. P-107

৪. Ramabai, Pandita, Stri Dharma Niti (in Marathi), Pune, 1882. P-149

৫. দে,প্রবীর কুমার, ঘোষ, শ্রাবণী, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা(প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক), কল্যাণী পাবলিশার্স, লুধিয়ানা, নিউ দিল্লি, নয়দা, ট্রনিকা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই, কলকাতা, কটক, কোচি, ব্যাঙ্গালোর, গৌহাটি, ২০২১, পৃ.১৪৯-১৫২।

৬. রায়, শর্মিলা, নারী জাগরণে পন্ডিতা রামাবাইয়ের ভূমিকা ও জীবনসংগ্রাম, করিমগঞ্জ, ২০২০ পৃ. ৪৯ ।

৭. তদেব পৃ. ৫৫